জামাত-শিবিরের রাজনীতি
এবং
সার্ফ এক্সেলের বিজ্ঞাপণ

ভূমিকা না করে বিষয়ে চলে যাই । মুক্তিযুদ্ধের কথা দিয়েই শুরু করি। আমার জন্ম মুক্তিযুদ্ধের পর। তাই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সবকিছুই শোনা কিংবা পড়া। সত্যি বলতে গেলে, মুক্তিবাদী, যুক্তিবাদী, চেতনাবিদদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য নতুন প্রজন্মের কাছে যে অক্লান্ত আহ্বান সেটা আমার চেতনায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারেনা। তবে সৌভাগ্যবশত যাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা, তাদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ আমার রয়েছে। তা যে থাকতেই হবে। না হলে মুক্তিবাদী বুদ্ধিমান যুক্তিবিদদের ছ্যা ছ্যা রবে আকাশ বাতাস কম্পিত হতে শুরু করবে। অবশ্য আমার বা আমাদের শ্রদ্ধাবোধ থাকা না থাকায় কিছু যায় আসেনা। তাতে করে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার অবস্থারও কোন পরিবর্তন হবেনা, অক্লান্ত আহ্বানকারী চেতনাবিদদের ক্লান্তিও দূর হবেনা।

ভূমিকা না বাড়ানোর কথা থাকলেও এতক্ষণ মনে হয় ভূমিকাই করলাম।কেউ কথা রাখেনি,কেউ কথা রাখেনা। কথা রাখেনা বাংলার জনমানুষেরাও। নিজামী-সাঈদীরা একাত্তরের রাজাকার,জঘন্য, কুৎসিত, হীন চরিত্রধারী হবার পরও বাংলার মানুষ তাদেরকে আবার রাজমুকুট পরিয়ে দেয়। অবাক হয়ে যাই, কী ব্যাপক পরিমান ব্যক্তিগত যোগ্যতা থাকলে কোন রকমের ব্যালট বাক্স চুরি ছাড়াই শুধু জনগনের ম্যান্ডেট নিয়ে নির্বাচিত হতে পারে নিজামী-সাঈদীরা। কীই বা হতে পারে এর কারণ। কারণ-অকারণের টানাপোড়েনের মাঝখানে টিভি চ্যানেলগুলোতে দেয়া সার্ফ এক্সেল এর বিজ্ঞাপণের কথা মনে পড়ে যায় - *'দাগ থেকে যদি ভালো কিছু হয় , তাহলেতো দাগই ভালো।'* রাজাকার থেকে যদি ভাল কিছু হয় - কি বলা যেতে পারে? না কী এত এত জঘন্য অপরাধীর সৃষ্টি হয়েছে যে রাজাকাররাই এখন সন্মানজনক অপরাধী।

সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে কোন রকমের জলপাইবাহিনীর সমর্থন ছাড়াই, যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় বাংলাদেশের মানুষ যাদের স্পষ্ট হাত দেখতে পায় সেই সি,আই,এ'র যোগসাজশ ছাড়াই শুধু জনগণের ভালোবাসা নিয়েই তারা সংসদে এসেছেন। ভালোবাসা শব্দটা শুনতে মনে হয় খুব খারাপ শোনালো। সে রকমই হবার কথা। কারণ চেতনাদানকারীরা ঘৃণা, নরঘাতক, ধর্ষণকারী, দোসর এ সমস্ত শব্দই বেশী পছন্দ করেন। এমনকি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার নাম করে নতুন প্রজন্মকে এসব শব্দ অনেকটা মুখস্থই করিয়ে দিচ্ছেন চেতনাবিদরা।

একাত্তরে যে আপরাধ সংঘটিত হয়েছিলো সেটা কখনো ভুলে যাবার মত নয়, এইটুকু উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু সে সময়ে যারা একাত্তরের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছিলো শত চেষ্টা করেও সে অনুভূতি সে চেতনা নতুন প্রজন্মের মধ্যে জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। নতুনরা বর্তমানের দিকে তাকাবে সেটাই স্বাভাবিক। আর বর্তমান নিজামী-সাঈদীর পক্ষেই রায় দেয়। বর্তমান বলে তারা ভোট চুরি করে সংসদে আসে না। চাঁদাবাজি করে, সন্ত্রাস করে সংসদে আসে না। অবাক করা বিষয় হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ধর্ষণের কথা ভেবে যাদের আজও কান্না থামেনা, বর্তমানের দশ বছরের বালিকা, আট বছরের শিশু ধর্ষণের ঘটনায় তাদের একটুও কান্না আসে না। ডঃ হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, *'বাংলায় এমন কোন পিতা পাওয়া যাবেনা যিনি পুত্রকে সৎ উপার্জন করতে বলেন না, আবার খুব কম সংখ্যক পিতাই পাওয়া যাবে যারা পুত্রের অসৎ উপার্জনে গর্ব বোধ করেন না।'* সে রকমই হয়তো বলা যেতে পারে, *'বাংলায় এমন কোন চেতনাবাদী পাওয়া যাবেনা যিনি ধর্ষণের বিরুদ্ধাচরণ করেন না, আবার খুব কম সংখ্যক চেতনাবাদীই পাওয়া যাবে যারা মনে মনে ধর্ষণের ইচ্ছা পোষণ করেন না।'*

রবীন্দ্রনাথের হৈমন্তী'র কথা মনে আছে নিশ্চয়। হৈমন্তীর বাবার একটা কথা ছিল যে, *'অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রক্ষা করিতে যাবার মত এত বড় বিড়ম্বনা আর নাই'।* যতদূর জানা যায় আমাদের বাবাও রাজাকারদের একদা ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমাদের বাবার দয়ার শরীর। কিন্তু তাই বলে তার সন্তানদেরও দয়া-মায়া থাকতে হবে এমন কোন কথা আছে নাকি? তাইতো তার সন্তানেরা গেয়ে উঠেন, 'বাবার বাংলায় রাজাকারের ঠাঁই নাই।' ক্ষমাই যদি করে দেয়া হবে তবে আবার ঠাঁই না দেওয়াটা কী বিড়ম্বনা নয় ?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এদের সাফল্য আসে কী করে? চেতনাবাদীরা দাবী করে নিজামী সাঈদীর জয়ের পিছনে তাদের বিন্দুমাত্র কৃতিত্বও নেই। এরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে থাকে। বাংলার ধর্মান্ধ মুসলমান ধর্মভীতি থেকে তাদের ভোট দিয়ে থাকে। কথা হচ্ছে সেটাই যদি হবে তাহলে তিনশ আসনেই ধর্মান্ধ মুসলমান তাদের নির্বাচিত করে ফেলত। বাস্তবে সেটা কখনই ঘটছেনা। বস্তুত, সব রাজনৈতিক দলই কিছু না কিছু নিয়ে রাজনীতি করে। কেউ করে ধর্ম নিয়ে, কেউ করে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে, কেউ করে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে। শুধু কেউই করেনা জনগণকে নিয়ে। আর ইসলামইতো উৎসাহিত করে রাজনীতি। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি, হাতের বদলে হাত আর খুনের বদলে খুনের রাজনীতি। তাহলে সমস্যা যদি কিছু থেকে থাকে সেটাতো ইসলামের, সেটাতো ধর্মের, সেটাতো নিজামী সাঈদীর নয়। আমারতো মনে হয়না মডারেট মুসলিম,মডারেট ইসলাম বলে কোন কিছু থাকতে পারে। ইসলাম জিনিসটাই ডিজিটাল। হয় ধার্মিক বা অন্য কথায় মৌলবাদী, না হয় অধার্মিক বা নাস্তিক। অবশ্য বকধার্মিক ব্যাপারটা যদি বিবেচনা না করে থাকি। অতএব, ধর্ম যদি কেউ মানতে চান তাহলে ধর্ম নিয়ে রাজনীতিকে মেনে নেয়াটাই যৌক্তিক।

যাই হোক, অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতার ব্যাপারেতো অনেক হোলো, এবার নিজের দেখা বিষয়গুলো নিয়ে একটু বলি।

জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কথাশিল্পীরা এভাবেই বলেন। কালের বিবর্তনে আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন,প্রতিসরণ, অপবর্তন ঘটিয়ে সেখানে আজ অনেক কিছুই হয়। রাজনীতি হয়, প্রেম-প্রীতি হয়,বিতর্ক হয়, সভা হয়, সেমিনার হয়, আড্ডা হয়, র‍্যালী হয়, মানববন্দন হয়,শিক্ষাসফর হয়, ভালোবাসা হয়, বন্ধুত্ব হয়, হয়না শুধু লেখাপড়া। রাজনীতি যেহেতু হয় সেই রাজনীতি আর সেশানজটের কল্যাণে প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড একাধিক সরকারের আমলে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। সুযোগ না বলে দূর্যোগ বলাটাই বোধহয় শ্রেয়।

এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ছাত্রশিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ হওয়া উচিৎ কিনা সে ব্যাপারে বিতর্কে যেতে চাইনা। বিতর্কে যেতে আপত্তি নাই, তাই বলে ভণ্ডদের সাথে বিতর্ক করার আগ্রহও নেই। ভণ্ডরা বিয়াত্রিচের নাম করে আবৃত্তি করে, 'I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it'। কিন্তু সুখের বিষয় হচ্ছে 'Survival of the fitest' সূত্র ভণ্ডদের জন্য বসে থাকেনা। সেই সূত্র ধরেই ঢাবি ক্যাম্পাসে শিবিরের কর্মকাণ্ড ও বিস্তৃতি বন্যার পানির মতই বেড়ে যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে বিপদ সীমানার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

যে সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত উপায়ে ছাত্রশিবির ক্যাম্পাসে রাজনীতি করে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো সেটা শুধু স্বপ্নেই কল্পনা করতে পারে।সাধারণ স্টুডেন্টরা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে ছাত্রশিবিরের রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। নতুন একজন ছাত্র ভর্তি হলে তাদেরকে উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, খেতে-শুতে, ছাত্রলীগ ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের সালাম দিতে দিতে মুখে ফেনা তুলে ফেলতে হয়। এমনকী সেটাই তাদের রাজনীতি। প্রথম দ্বিতীয় বর্ষের একজন ছাত্র যতবার জনক বাবা আর ঘোষক বাবার নামে জয়ধ্বনি দেয় ততবার আল্লাহ আল্লাহ করলে তাদের বেহেস্তে যাবার পথ অনেকটাই সুগম হয়ে যেত। একটু এদিক সেদিক হলেতো চড় থাপ্পড় আছেই। কথায় কথায় রুম থেকে বের করে দেবার হুমকিতো নিত্তনৈমত্তিক ঘটনা। শেখ হাসিনার আমলে হঠাৎ একদিন শহীদুল্লাহ হলে ছয় রাউন্ড গুলির শব্দে সবাই যখন আতঙ্কিত তখন খবর নিয়ে জানা গেল এক ছাত্রলীগ ক্যাডারকে সমাবেশে যোগ দেবার জন্য ঘুম থেকে উঠানো যাচ্ছেনা, তাই ছয় রাউন্ড গুলির শব্দ করে তাকে ঘুম থেকে উঠানো হয়েছে। প্রথম বর্ষের একজন ছাত্র যখন এসে এসমস্ত দেখে , দেখে কাকের গায়ে গুলি করে করে নিশানা ঠিক করছে আমাদের ভবিষ্যতের মন্ত্রী-এম,পি'রা, তখন কীইবা হতে পারে তাদের মনোভাব। বহু ছাত্রকে জুতার মালা গলায় পরিয়ে চরম অবামাননায় সে দিন হলে হলে, ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে ঘুরিয়েছিলো

মুজিব জিয়ার বীর সৈনিকেরা। জুতার আঘাতে থাপ্পড় মেরে মেরে সেদিন লাল করে ফেলেছিল বহু ছাত্রের মুখ। সেদিন তাদের বুক ফাটানো কান্নার সাথে সাথে নীরবে ঝরে পড়েছিল বহু ছাত্রের চোখের জল। তাদের অপরাধ ছিল কিংবা অভিযোগ ছিল তারা পরোক্ষভাবে শিবিরের সমর্থক। বলা বাহুল্য প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রশিবির করার সুযোগ ঢাবি ক্যাম্পাসে নেই।

ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা প্রথম বর্ষের সহজ সরল ছাত্রদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, টিউশানির ব্যবস্থা করে দিয়ে দলে টানতে চেষ্টা করে। নরম কমল সুরে তাদের সাথে কথা বলে তাদেরকে একসময় দলীয় কর্মী করে ফেলে। কিন্তু সেটাই কী হওয়া উচিৎ নয়? মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গ্রামীন পরিবারের একজন মেধাবী ছাত্রের জন্য একটা টিউশানি যে কতটা প্রয়োজন সেটা লন্ডন আমেরিকায় বসে বসে আগা-মগা-জগা চৌধুরীরা কী করে বুঝবেন? অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো নিজেরা সেটা করবে না, কেউ করলে তাও মানবেন না, সেটা কী করে হয়?

সাংগঠনিক দিক থেকে দেখা যায় ছাত্রলীগ, ছাত্রদলে যে যত বেশী অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে সে তত বড় নেতা, পরবর্তীতে সে তত বড় পদে আসীন হয়। অথচ শিবিরের নেতৃত্বে আসীন নেতা কর্মীরা বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে ঈর্ষণীয় সাফল্যের অধিকারী। যে কেউ সামান্য খোঁজ খবর করলেই এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন। শিবিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা বিভিন্ন শহরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু কোচিং সেন্টার পরিচালনা করে থাকে, যাদের অনেকগুলোতে থাকার ব্যবস্থাও আছে এবং তারা কৌশলে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যেগুলো অভিযোগ প্রকৃত বিচারে সে সব তাদের প্লাস পয়েন্ট এবং পজিটিভ দিক। প্রশ্ন হতে পারে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর কোচিং সেন্টার নেই কেন, তারাও চাঁদাবাজি না করে কোচিং সেন্টার দিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিলেইতো হয়। নাকী রাজপথে গাড়ী ভাংচুর করতে করতে আর শিক্ষাভবন,নগরভবনে গিয়ে টেন্ডারবাজি করতে করতে তাদের সময় শেষ হয়ে যায় ? কথিত আছে যে সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন নেতা পদ পাওয়ার জন্য লবিং করতে গেলে জনগণের একমাত্র জননেত্রী তাদেরকে কে কয়টা গাড়ী ভাংচুর করেছে তার পেপার কাটিং নিয়ে আসতে বলেছিলেন।

গ্রাম থেকে একজন মানুষ চিকিৎসার জন্য ঢাকা আসলে নির্দ্বিধায় চলে যায় ইবনে সিনা হসপিটালে, চলে যায় ইসলামী ব্যাংক হসপিটালে। একজন স্টুডেন্ট শহরে কোচিং করতে এলে চলে যায় রেটিনা কিংবা ফোকাস এ। কারণ তারা ভালো করেই জানেন জামাত শিবিরের সমর্থনপুষ্ট এ প্রতিষ্ঠানগুলো আর যাই করুক তাদের গলা কেটে রাখবেনা, ঠকবার সম্ভাবনা সেখানে অনেক কম। ইসলামি ব্যাংক এর সুনামতো সর্বজনবিদিত। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে তাদের সততা, নিষ্ঠা এবং সেবাদানের মাধ্যমে। অন্তত এ সমস্ত ব্যাপারগুলোতে

তাদেরকে সাধুবাদ না জানানো এক ধরনের অপরাধও বটে। জামাত-শিবিরের অপরাধ আছে তারা পুরনো পাপী, কিন্তু তারাইতো আবার নতুন দিনের দিশারী নয়?

ছাত্রশিবিরের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কোরাআন ও হাদীসের আলোকে শাসনতন্ত্র কায়েম করা। তাই ছাত্রশিবির ক্যাম্পাসে ভালোবাসা দিবসের প্রোগ্রাম হতে দিবেনা, কনসার্ট করতে দেবেনা। মেয়েদেরকে বোরখা পরা ছাড়া আসতে দিবেনা। সেটাইতো স্বাভাবিক। ইসলামতো সেরকম নির্দেশই দেয়। ছাত্রশিবিরের কর্মীরাতো নিজেদেরকে ইসলামের সৈনিক বলেই দাবী করে। দাবী অনুযায়ী তাদের আচরণও হয় সে রকম। সূতরাং সমস্যা যদি কোথাও থেকে থাকে তবে সেটা ইসলামের সমস্যা, শিবিরের সমস্যা নয়। কেউ যদি বিশ্বাস করে দুইয়ে দুইয়ে যোগ করলে পাঁচ হয়, তাহলে সে বলতেই পারে, দুইটা কলা আর দুইটা কলা মিলে পাঁচটা কলা হয়, দুইটা কলম আর দুইটা কলম মিলে পাঁচটা কলম হয়। সে ক্ষেত্রে তার পাঁচটা কলা আর পাঁচটা কলমের হিসাব অবশ্যই সঠিক। সঠিক নয় তার বেসিক দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে পাঁচ হবার ব্যাপারটা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কেন আমি ছাত্রশিবির করবো না? আমার জন্য উত্তর দেয়াটা খুব সহজ। চৌদ্দশ বছর পূর্বের দেয়া আইন দিয়ে বর্তমানের কোন সভ্যজাতি চলতে পারেনা। বর্বর আরবজাতি একদা ঊষর মরুর বুক থেকে কিছুই উৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়ে আকাশ থেকে উৎপাদনের রাজনীতি শুরু করে,আকাশের পাণে তাকিয়ে থেকে তারা বের করে আনে আরব্য রজনীর গল্প আর নতুন নতুন গল্পের মোড়কে নতুন নতুন সব ধর্ম। সে গল্পের রেশ কাটতে সময় লাগবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে গল্প যারা বিশ্বাস করে সে অনুযায়ী কাজ করে যায় তাদেরকে আমরা ঘৃণা করতে পারিনা, যেমন পারিনা ধর্মপ্রাণ,ধর্মান্ধ এ দেশের নবীন কোন স্টুডেন্ট যখন জিজ্ঞেস করে কেন আমি ছাত্রশিবির করব না সে প্রশ্নের উত্তর দিতে। কারণ এ কথা তাকে বুঝানো খুবই কঠিন যে, ধর্ম ছিল বর্বর আরবদের রাজনীতি আর অর্থনীতির মারপ্যাঁচ,বেঁচে থাকার সহজ একটি উপায়মাত্র।

পরশপাথর
poroshpathor81@yahoo.com